পালকের চিহ্নগুলো

[আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা]

পালকের চিহ্নগুলো

নাসরীন জাহান

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-683-001-9

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

পা ল কে র চি হ্ন গু লো
নাসরীন জাহান

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৪৯৬ টাকা

Paloker Chinhogulu
by Nasreen Jahan

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

যিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো আলোর ইশকুল না খুললে
লেখক জীবনের শুরুতেই বিশ্বসাহিত্যের দরজা আমার
সামনে খুলে যেত না।

এক

আজ বহুদিন পরে মনে হচ্ছে, যতই অসংলগ্ন হোক আমি আমার জীবনের স্মৃতি নিয়ে কিছু লিখবো। আমি ভাগ্যবান, একটা শতাব্দীর দুই প্রান্ত দেখেছি। জীবনকে হুহু করে পালটে যেতে দেখেছি। আমি এনালগ এবং ডিজিটাল দুই জীবন দেখেছি। কবে কী বোধ থেকে বার বার উচ্চারণ করতাম—এনালগ শতাব্দীর দিনরাতগুলো এত সুন্দরতম দীর্ঘ ছিল! মনে হল, আমি বহুদিন আগে প্রতিটা মুহূর্ত যেন ছুঁতে পারতাম। প্রযুক্তির এই শতাব্দীর একটা মাস যেন এক-একটা দিনের মতো হয়ে গেছে।

ক্যালেন্ডারের পাতা উলটালেই ধাক্কা খাই। এত জলদি মাস চলে গেল! বছর গেল! এখন ফের একটা মাস যেন একটা দিনের মতো হয়ে গেছে। আগে অপেক্ষা করতাম। অপেক্ষাগুলো ছিল অন্যরকম। রাস্তায় হেঁটে হেঁটে কখন গলির মাথায় ডাকপিয়নের দেখা পাবো?

পিওনের ছিল টেকো মাথা। সে মাথা সদ্য প্রেমে পড়া প্রেমিকের মতো। কারণ তার হাতে হয় আমার প্রেমিকের নয় পত্রবন্ধুদের চিঠি আসবে। এবং যাকে ভালোবাসতাম, প্রকাশ করতাম না, তার চিঠির জন্য দুর্মর অপেক্ষাও থাকত। কী চমৎকার ছিল সেইসব অপেক্ষা!

আমি আর রুবী (কথাসাহিত্যিক পারভীন সুলতানা) এক সাথে রোমাঞ্চিত হতাম। স্কুল বয়সেই আমাদের সারা দেশের লেখকদের সাথে পত্র যোগাযোগ ছিল।

আমার ছোট বোন ঝর্না আমাদের সেইসব দিনের অপরিহার্য অংশ ছিল। আসলে তখন মোবাইলহীন, ফেসবুকহীন জীবন

অনেক সুন্দর আর গভীর আর স্থিতিশীল ছিল। এসব ছাড়া তখনকার যোগাযোগে কোনো অজুহাত ছিল না। যখন যেখানে যাওয়ার কথা ঠিক এক সাথে সময়মত জড়ো হয়ে যেতাম। প্রতি বছর পিকনিকে যাওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতেই ছিল না।

বইমেলা ছিল স্নিগ্ধ। মনে হত এই মেলা আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। মেলায় হইচই, মিডিয়া ছিল না। মোড়ক উন্মোচন—এসব ছিল না। আর সারা বছর প্রায় যোগাযোগহীন অবস্থায় বইমেলায় গিয়ে দেখা হলে উন্মাদনায় উচ্ছল হতাম। সিনিয়র লেখকদের সাথে দেখা হলে ছবি তোলার উন্মাদনা ছিল না। এই মুহূর্তে গভীরভাবে একটা স্মৃতি মনে পড়ছে, একবার ইলিয়াস ভাইয়ের (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) সাথে ঘাসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একটা স্টলের সামনে প্রচুর ভিড় ছিল। বাদাম খেতে খেতে ইলিয়াস ভাই মজা করে বললেন, তোমার স্টলের সামনে এমন ভিড়ের স্বপ্ন দেখছ না তো? তখন আমরা জানতাম, মানিক-জীবনানন্দের জীবদ্দশায় এঁদের তেমন পাঠক ছিল না। আমি বলেছিলাম, ভিড় করে আমার বই কিনবে? আপনি জানেন, এই দেশে এমন লেখক হতেই পারব না আমি। আপনি নিজে এত বড় লেখক হয়েও এ কথা বলছেন?

আহা! আমরা ইলিয়াস ভাইয়ের বাসায় যেতাম। একেকটা আড্ডা তো নয়, মনের ভেতর শত শত মুক্তো নিয়ে ফিরতাম। ইলিয়াস ভাইয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ল। আমরা তখন কলকাতায়। হাসপাতালে ইলিয়াস ভাইকে দেখতে গেলাম। সেই প্রচণ্ড হাসি! কোনো বিকার নেই। বলেন, ক্যামো দিলে অসাধারণ এক শিহরণ হয় শরীরের মধ্যে! আমরা অবাক! বলেন কী?

এত বড় প্রচণ্ড মানুষটার পা গোড়ালি থেকে কাটা। বসে আছেন কায়দা করে ড্রয়িং রুমে! একই রকম কথার তোড়। আমার লেখা গল্প *একটি দীর্ঘ উপন্যাসের ডালপালা* পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, এই গল্পের মধ্যে পাঁচটি গল্পের থিম আছে। কীভাবে তুমি লেখার সময় একটা গল্পেই সব উজার করে দাও? ইলিয়াস ভাইয়ের শূন্যতা আমি আজীবন অনুভব করেছি সাহিত্য পাড়ায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, গাড়িতে বসে যানজটেও মোবাইল ওপেন করি না। আমি চারপাশে নানারকম মানুষ দেখি। একেকজনকে দেখে একেক গল্প মনে হয়, মনে হয় এই লোকটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দেয়া, সে কি সবে গ্রাম থেকে এসেছে? চুলো জ্বালিয়ে পিঠা বানানো নারীর ঘরে কে কে আছে? তাদের ছেলেমেয়ে কি পড়াশোনা করে? এমন কত রকম মানুষকে দেখে কত কথার ভিড় জমতে থাকে মাথায়!

এই এলাকাটা অন্য এক স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে। হাসপাতাল, বাজার, ক্লিনিক, সুপারশপ—ছোট একটা জিনিসের জন্যও বাইরে যাই রাজ্যের যানজট ঠেলে, মিরপুর রোড পেরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হয়। তখন ছোটখাটো কিছু লেখার, কিছু খাওয়ার উসিলা খুঁজে বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটির বুনোপাখি নামক বাড়ি থেকে আশরাফ ও আমি বেরিয়ে পড়ি। কখনো অর্চি যুক্ত হয়। বেশিরভাগই রিং রোড ধরে বেরিয়ে যাই। বইমেলা, সাহিত্যের অনুষ্ঠানগুলো মূল শহরে হয়ে থাকে বলে সেখানে যাই। অথচ প্রথম জীবনে ঢাকায় এসে বই মেলায় যেতাম না, এমন কোনোদিন ছিল না।

যাহোক, তিরাশি এবং নব্বইয়ের শুরুতেও তখন আমরা নিজেরা ঘুরে ঘুরে সবার আগে নিজের বন্ধুর বইটা কিনতাম। তখন পিকনিকে, বইমেলায় কীভাবে মোবাইল, ফেসবুক এমনকি টিএন্ডটি ফোন ছাড়াও আমরা যোগাযোগ করে ঠিক সময়মত এক সাথে জড়ো হয়ে যেতাম...এখন ভাবলে অবাক লাগে।
এই বিভ্রমময় দিনগুলোর হিসাব মেলাতে গেলে বেক্কল লাগে নিজেকে। তবে কি পাহাড়ে উঠছি ভেবে পাতালে গড়াচ্ছি? যত যোগাযোগ সহজ হয়েছে, তত অজুহাত বাড়ছে? মনে পড়ছে প্রথম লেখার স্মৃতি, শৈশব থেকে আমি প্রকৃতিপাগল। বাল্যকালে সরষে-মাঠে পড়ে থাকতাম ঘ্রাণে আকুল হয়ে।
যুদ্ধের পরে রূপকথার গ্রাম ছেড়ে ইটপাথরের মফস্বলের বাড়িতে দম আটকে আসত। ময়মনসিংহ শহরে এসে সানকিপাড়া প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস টু-তে ভর্তি হলাম।

দীর্ঘ রেললাইন পেরিয়ে তারপর অনেকগুলো দোকান। সেখানে বাংলা সিনেমার গান বাজতো। ওই বয়সে রেললাইন টপকে ওই গানে আটকে যেতাম। আশ্চর্য! প্রায়ই তখন যেন একটা গান শুনতাম। 'গীতিময় সেইদিন চিরদিন/ বুঝি আর রলো না'। ক্লাস টু এর এক বালিকা ধীরে ধীরে ঘোরগ্রস্তের মতো সামনে চলতো। দোকানের পরে দোকানে বাজতে থাকা সেইসব গানের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে যেতো ছোট ছোট পা।

প্রতিদিন স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যেতো। প্রতিদিন ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে যেত আমার। বাবা-মা সেখান থেকে আমাকে তুলে আনতো। ক্লাস ফোরে প্রথম ছড়া লিখি স্কুলের বসন্ত উৎসবে। তখন ছন্দের সাথে মন্দ এসব বুঝে গেছি। তাল ঠিক করতাম গায়ে থাপ্পড় দিয়ে দিয়ে।

জীবনের প্রথম লিখি, 'বসন্ত এলো ও বসন্ত এলো,/ হে ময়ূর তুমি পাখা মেলো।' মুক্তিযুদ্ধের হাহাকার পেরিয়ে তখন যেন আমার হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা। ময়মনসিংহের প্রচুর স্মৃতি আর বাস্তবতা পেরিয়ে ঢাকায় এসে ভর্তি হয়েছিলাম হলিক্রসের শাখা স্কুল বটমলী হোমসে। ছোট ফুপুর মেয়ে শীলা, শবনম জাহান যার নাম—তার নামের সাথে মিলিয়ে ফুপু আমার নাম নাসরীনের সাথে জাহান যুক্ত করলেন। সেই শীলা এখনো আমার প্রাণের সাথে জড়িয়ে আছে। আমি কোনো কিছু ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করতে পারি না। তাই কোনোদিন কল্পনাতেও ছিল না স্মৃতিকথা লিখব। কিন্তু কিছু তীব্র আন্তরিক তাগিদে লিখতে শুরু করলাম; জানি না কোথায় গিয়ে থামব। বিছানায় গেলে ধেয়ে আসে স্মৃতি। তখন অনেক সীমাহীন তেপান্তরে বেলুন ওড়ানো দেখতে যাই, অথবা উড়াই, নিজেকে প্রশ্ন করি, মন, তুমি যতই মনে মনে কিশোরী যুবতি হয়ে থাকো, তোমার দেহ বার্ধক্য ছুঁয়েছে। যুবতি বয়সে দারুণ রোমান্টিক লাগে 'এক সাথে বুড়ো হব' টাইপের বাক্য। যখন মনের বয়স বাড়তেই চায় না, দেহের বাকল শক্ত হয়ে, অথবা ঢিলে হয়ে ভাঙতে থাকে। বার্ধক্যের ছাপ দেহের কানায় কানায়। নিজের মনকে সেই বয়সের মধ্যে ঠেসে বয়সের আচরণ

করা যে কী মুশকিল হয়ে ওঠে! কেবল নাটক, কেবল ছদ্মবেশ!

হা হা হা...এখন তো মনে হয় দিনকে প্লাস্টিক বানিয়ে বার বার কাটতে গিয়ে দাঁত ভেঙে যায়। জিহ্বা অসার হয়। আমি কি নিজের অজান্তে দিনকে প্লাস্টিক বানিয়ে মাস চিবুই? আহা! নিজেকে ঝাঁকড়া রোদে যদি তাপিয়ে আনতে পারতাম!

আমরা শহরে এলেও নানার বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকতাম। তখনও ছোটই ছিলাম; নিজেদের কিছুতেই শহরের জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারতাম না। কিন্তু আরও অনেক পিচ্চিবেলা থেকে লক্ষ করতাম, নানি সিলিং থেকে এনে পিতলের বড় বয়াম থেকে কী যেন খুব গোপনে বের করে আনতেন, যা ঝনঝন করত। যখন কেউ থাকত না, নানি গোপনে সেই বয়ামের মুখ খুলে উদ্ভাসিত চোখে কী যেন দেখত।

একদিন একটা চকচকে আধুলি বিছানায় পড়ে গেলে আমি বিহ্বল চোখে দেখি, যেন আসমান থেকে তারা খসে পড়েছে! নানি দ্রুত তা তুলে বয়ামে ভরে বলেন, যা, এইসব ছোটদের জিনিস না। তখন আমি *ঠাকুরমার ঝুলি* পড়ে ফেলেছি। ফলে চোখের সামনে এসে পড়া সেই আকাশের তারা সারা দিন সারা রাত চোখে আটকে থাকে। যেন রূপকথার রাজ্য থেকে কোনো চৌকস পাথর ছিটকে পড়েছে! কিছুতেই যেন সেই রুপোলি তারা জীবন থেকে খসে পড়ে না। এক সময় নিজেকে ক্রমশ বিন্যস্ত করে নিই।

আমরা অবশ্য শৈশবে নানার বাড়ি থাকতে কোনো কিছুর অভাব অনুভব করিনি। কিন্তু ময়মনসিংহ শহরে থাকা আমাদের অ্যাডভোকেট বড় মামার যখন মেয়ে হল, আমার বয়স তখন দুই। পরপর দুই ছেলে। তাদের নিয়ে অনেক স্মৃতি থাকলেও সবচেয়ে জোরালো স্মৃতি ছিল একটা : একবার তারা গ্রামে বেড়াতে এলো। তখন আমরা ছয় ভাই-বোন শহর গ্রাম করলেও দড়িনগুয়া গ্রামটাকেই নিজের বলে আঁকড়ে ধরেছিলাম। শহরে যতদিন থাকতাম দম আটকে আসত। ছোট খালা রেনুর বিয়ে হলেও সে

নানা বাড়ি থাকত। তুখোড় ভার্সিটি-ছাত্র খালুর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নানা।

যখন খালু বাড়িতে আসত বাড়িতে আধুনিকতার জোয়ার বইতো যেন। খালুর তত্ত্বাবধানে মামা-খালারা, মাঝেমধ্যে আমরাও কার্ড নিয়ে নাইন্টি ফাইভ খেলতাম। মামারা, বিশেষ করে মেঝো মামা এখলাছ তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত ছিলেন। বাড়িতে তখন একটা উদার হাওয়া বইত। খালা দারুণ অভিমানী আর জেদি ছিল। খেলায় হারলে বা কেউ চোট্টামি করছে টের পেলে সে সব কার্ড ছিঁড়েখুঁড়ে খালুর মুখে ছুড়ে মারত। খালু তখন খালার পেছন পেছন ঘুরে গান গাইত, 'নাইন্টি ফাইভ আর খেলব না, স্ত্রী বলে স্বামী না, এমন তো আর দেখি না'। সেই গান নানা বয়সের নানা প্রান্তে আমার কানে গুঞ্জরিত হয়েছে। এখনো হয়। জীবন বাস্তবতায় আমরা কোথায় কীভাবে ছিটকে গেলাম! খালা খালুকে কিল দিয়ে ছুটত, খালুও পেছন পেছন...এ নিয়ে আশেপাশের মানুষ মজাই পেত। পরে, কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজের অধ্যাপক খালু তবলিগে যাওয়া শুরু করলেন। খালা এই জীবন সহ্য করতে পারতেন না। তাদের সন্তানরা জাঁহাবাজ স্টুডেন্ট, কিন্তু এখন তাদের শিক্ষিত বড় মেয়ের বাইরের পুরুষ মানুষের কণ্ঠ শোনাও পাপ। সে আপন মামাতো চাচাতো যেই হোক।

খালা অবশ্য তেমনই ছিলেন। খালু ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। আমাদের সাথে খালুর ব্যবহার কখনও বদলায়নি। খালুর সামনে যেতে মাথায় ওড়না টানতে হয়নি কোনোদিন। কিন্তু খালুর বড় ছেলের বিয়েতে গিয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বড় ছেলে, সারা জীবন ক্লাসে যে ফার্স্ট ছিল, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি থেকে দারুণ রেজাল্ট করে পাস করেছে। দারুণ চাকরি করে। দেখি, তার পরনে সৌদি আরবীয় পোশাক। খালুকে পর্যন্ত সে তার বউয়ের মুখ দেখতে দেয়নি, খালু পরপুরুষ বলে। খালার সে কী কান্না, সেই যে জেদ ধরলেন, বউয়ের মুখ তিনিও দেখবেন না, তার মীমাংসা কোথায় গিয়ে হয়েছিল এ আমি আর দেখতে যাইনি।

অথচ জন্মের পরে এই ছেলেটার বাংলা ডাক নাম আমি

আমার শিশুদের জন্য লেখা গল্পের চরিত্র থেকে রেখেছিলাম। ওর জন্মের পরে নানা বাড়িতে বেশ কয়েক বছর সে আমার আর পিঠাপিঠি বোন ঝর্নার আত্মার সাথে জুড়ে ছিল। মনে পড়ে, খালা যখন সন্তানসহ স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, আমি আর ঝর্না অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বাসের পেছন ধরে অনেকদূর গিয়েছিলাম। খালু সন্তানদের ধর্ম শেখাতে চেয়েছিলেন, তারা ধর্মান্ধ হয়ে রীতিমতো আত্মীয়চ্যুত হয়ে যাবে, এ তিনি কল্পনাও করেননি।

যাহোক, একদিন নানার বাড়ির রূপকথার প্রথম কাগজ ছিঁড়ে যায়, এর মধ্যে একবার সপরিবারে বড় মামারা বাড়ি আসেন। আমরা হট্টগোল করতে করতে দেখি, মামাদের দুই পুচকে ছেলে সেই আকাশের তারা নিয়ে লোফালুফি খেলছে। আমি এগিয়ে যেতেই পেছনে লুকিয়ে জানায়, এইসব রুপোর আধুলি। দাদি তাদেরকে যত্ন করে রাখতে বলেছে। আহা! রুপোর আধুলি! সেই জীবনে একটা আধুলি যদি নানি আমাকে দিত, আমি সারাজীবন যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতাম না? পুত্র আর কন্যা সন্তানদের ভেদ এত তীব্রভাবে আমার শৈশবের বুক চিড়ে দিত?

এ আমার আত্মজীবনী নয়, তা লেখা সম্ভবও নয় আমার পক্ষে, মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সুস্থ হওয়ার পরে বহু স্মৃতির আলো নিভে গেছে। বহু স্মৃতির ধারাবাহিকতা বলে কিছু নেই বললেই চলে। আমি কেবল একটা সময় এবং কিছু অনুভব ধরে রাখার জন্য যখন যা মনে পড়েছে খামচি দিয়ে এনে একটার পরে একটা জড়ো করছি।

আমি পৃথিবীর কত জায়গায় গেছি, লেখার জন্য কিচ্ছু দেখিনি, দেখার জন্য দেখেছি প্রাণ-মন ভরে।

আমি অবুঝের মতো হাঁ করে একেক দেশের একেক মানুষের সঞ্চালন দেখেছি। কাগজ কলম নিইনি, যেখানে ভিডিওর সুযোগ, করিনি।

আমি দলবাজির রাজনীতিও করিনি। কেবল স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ ছিলাম, আছি। শৈশব থেকে চারপাশে যখনই

মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে গণ্ডগোল বলেছে, আমার মন ক্ষিপ্ত হয়েছে। হিপোক্রেসি কাকে বলে আমি জানি না। কোন দিন কোন জায়গায় গেছি নোট করে রাখিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে, জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গার স্মৃতি নামসহ যদি লিখে রাখতে পারতাম ভালোই হত।

আত্মজীবনী বলে কিছু আসলে হয় না, মানুষ তার সিক্রেট জীবন কেন পাবলিক করবে? একজন মানুষের সাথে জড়িয়ে থাকে আরেকজন মানুষের প্রাইভেসি, কেন কেউ তা নষ্ট করবে? একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি, আত্মজীবনীর নামে যা লেখা হয়, কোন লেখক কার সাথে, কতজনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করলো, তা না লিখলে যেন লেখকের সাহসই প্রকাশ হয় না!

একাধিক প্রেম, একাধিক যত বিছানার সম্পর্ক নিয়ে লেখা যায়, তত সাহসের প্রকাশ। এই যেন আত্মজীবনীর উপজীব্য। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ কাউকে বাঁচালো কি না, সেটা সাহস নয়। কেউ সংগ্রাম করে কিছু করল কি না, তাও নয়। ফলে আত্মজীবনী অন্তত আমাদের জীবন বাস্তবতায় লেখা সম্ভব নয়, তা হয়ও না। কেন নিজের জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা আর স্মৃতির মিশেল এক সাথে জড়ো করলে তার নাম আত্মজীবনী দিতে হবে? খামোখাই পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়া?

সেই রুপোর আধুলি একটা সময় নানা জায়গায় আমার অতৃপ্তির বিষয় হয়ে উঠেছে। মনে পড়ছে, একটা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসামে গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকটা মঞ্চে প্রোগ্রামে অংশ নিই। একটা প্রোগ্রাম খোলা আকাশের নিচে। সাজানো মঞ্চে আমি বসে আছি। টানা কয়েক ঘণ্টার প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছে। এর আগে আয়োজক অধ্যাপক এলেন হোটেলে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি যখন বলেই যাচ্ছি পরকীয়ার ব্যাপারে, ধরা যাক, একজন স্বামীর সাথে স্ত্রী এক বিছানায় শুয়েও অন্য একজনের কথা ভেবে দহনে পুড়ে ছাই হচ্ছে, অথবা একজন স্ত্রীর পাশে একজন স্বামী, যে সারা জীবনের জন্য তার স্ত্রীর

মানসিক শারীরিক দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নিজের অজান্তে অন্য একটা বাতাস এসে তাকে যখন নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে—যা তাদের কারো হাতে নেই। স্ত্রী প্রাণপণে নিজের দহন স্বামীকে লুকাচ্ছে, অন্যদিকে স্বামীও লুকাচ্ছে স্ত্রীকে। এমন পরকীয়ার মধ্যে যেহেতু কেউ কাউকে দোষারোপ করছে না। নিজেরা পুড়ে মরছে, এর নাম কেন ব্যভিচার হবে? কারণ, এই একান্ত যাতনার বিষয়টা পাবলিক হলেই ঘরে বাইরে দহনের গোষ্ঠী কিলিয়ে কী বদনাম! শুধু কি বদনাম! সব ভেঙেচুরে ছাড়খার!

অধ্যাপক হাঁ হয়ে ছিলেন। আশরাফ চুপচাপ হাসছিল। ভদ্রলোক বললেন, আপনি এত অনায়াসে এর সাথে ওর বিছানা, ওর সাথে এর বিছানা কীভাবে বলেন? আমি বললাম, ধুর! লজ্জা পাচ্ছেন? এটা লজ্জা পাওয়ার কোনো বিষয় নয়। ইহাই জীবন বাস্তবতা। উনি বললেন, প্লিজ, কাল মঞ্চে এসব নিয়ে কিছু বলবেন না, এখানকার দর্শক অনেক রক্ষণশীল।

পরদিন মঞ্চে বসে আমি অবাক! অনেক দর্শক। তার মধ্যে আমার বইয়ের পাঠকও ছিল। তারা আমার শৈশব নিয়ে, লেখা শুরু নিয়ে, এবং কেউ কেউ আমার বই থেকে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, আমি নিমগ্নের মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে আশরাফ হঠাৎ দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোককে মিঠে জব্দ করতে প্রশ্ন করে, আপনি পরকীয়া আর জায়গা ভিন্নভেদে স্বামী স্ত্রীর দহন নিয়ে গতকাল কিছু বলছিলেন, আজ সেই কথাগুলো এখানে সবার সামনে আবার বলবেন? আমি বিব্রত মুখের অধ্যাপক ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়ে ফের সেই কথাগুলো যাতে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, যে পরকীয়া কেবল প্রেমের মধ্য থেকে জন্ম নেয়, বিয়ে পরিবারকে বাঁচাতে যাকে একটা পর্যায়ে যতটা গোপনে সম্ভব কোনো পুরুষ বা নারী প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়, তা কেবলই নষ্টামী নয়। এর মধ্যেও ব্যক্তি-মানুষের প্রচণ্ড বেদনাও জড়িত থাকে—এভাবে বলতে থাকি।

আমি এসব নিয়ে যখন বলে যাচ্ছি, আমি লক্ষ করলাম, সময়ের পর সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, দর্শক শ্রোতা মাথা নেড়ে নেড়ে

চুপ করে শুনেই যাচ্ছে, শুনেই যাচ্ছে। কারও লজ্জা বা অস্বস্তি হতে পারে এমন কোনো বিষয়ই আর রইল না।

ধীরে ধীরে সবার কাছে পরকীয়ার দহন বড় হয়ে উঠল। তারা অনুভব করতে পারল, আমি অমন একটা সম্পর্কের ভোগ নিয়ে কথা বলছি না, তারা এর পক্ষে নিজেদের অনুভবও জানাল ছোট ছোট করে। এমনও প্রশ্ন ছিল, কারো লাইফ পার্টনার অন্য কারো দিকে ঝুঁকলে সংসারে সর্বনাশ নেমে আসে, এটা মানেন তো?

আমি বললাম, অবশ্যই।

মুশকিল হচ্ছে, এর মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। বিয়ের পরে এক জীবনে মনকে হাজার বেঁধে রাখলেও তার কাউকে ভালো লেগে বুক পুড়বে না, এমন গ্যারান্টি মনই দিতে পারে না। তখন নিজেকে কঠিনভাবে বেঁধে সংসার করাই দাম্পত্যের নাম। ওদের শেষ প্রশ্ন ছিল, আপনি শুরুর জীবনের কোন জিনিসটা পাননি বলে আপনার শৈশব আপনার জীবনকে তাড়িত করেছে? আমার চোখের সামনে ঝলসে ওঠে নক্ষত্রের মতো রুপোর আধুলি। যা আমি কোনোদিন কোনো লেখায় আনিনি। যা কোনো সাক্ষাৎকারেও বলিনি। নিজের একান্ত গহীন এক অতৃপ্তি, যা আজ প্রকাশ করলাম। যা সেদিন আসামের প্রোগ্রামেও প্রকাশ করিনি। কিন্তু সেদিনের সেই প্রশ্ন আমার মনের কুয়োর একেবারে তলায় পড়ে থাকা আধুলিটি এক টানে আমার চোখের সামনে নাচিয়েছিল, যা মামাতো ভাইয়েরা স্বপ্নহীন চোখে মার্বেলের মতো ঘুরাচ্ছিল।

আপাতত প্রসঙ্গ পাল্টাই। আমার দাদার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আমার অন্যান্য চাচা ফুপুদের ধনাঢ্য জীবন দেখে তা সবাই আন্দাজ করতে পারত। বোহেমিয়ান, সুপুরুষ আব্বার বিপরীতে আম্মা দেখতে তেমন ভালো ছিলেন না। আমাদের জীবনে গ্রাম থেকে আসা আমার দাপুটে-কোমল আম্মা যদি আমাদের সংসারের হাল না ধরতেন—সেই পিচ্চিবেলা থেকে পিরিয়ড কী, সন্তান কীভাবে পেটে আসে, খারাপ স্পর্শ ভালো স্পর্শ এসব না বোঝাতেন, সম্পত্তিসহ আমরা কবেই জলের মধ্যে ভেসে যেতাম! ছুটিতে,

ঈদে আমরা কোনোদিন আব্বাকে কাছে পাইনি। এদিকে ওদিকে ভ্রমণরত আব্বা সংসারের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু এমন একটা শিশুর মতো মানুষ আমার খুব প্রিয়। আব্বা না থাকলে আমার লেখালিখি হত না, এটাও ঠিক।

আমি *বাংলাবাজার পত্রিকার* সাহিত্য সম্পাদক থাকাকালীন ছফা ভাইয়ের বাসায় অনেক যাওয়া পড়ত। সেখানে ডাকসাইটে শামীম সিকদারও খুব আসতেন। একদিন যখন জলের দামে জমি বিক্রি করে প্রায় ভিখারি হওয়া আব্বার কথা, এবং সেই কারণে দুর্বিপাকে পড়ে একদিন একবেলা ভাতের ঘ্রাণ নিতে কেমন উন্মাদ হয়ে পড়েছিলাম এসব গল্প করছি, ছফা ভাই বলেন, নাসরীন, তুমি আসলেই একটা ভেতরবাউলা মানুষ, তুমি ক্যান সংসারের মধ্যে ঢুকছ? চলো এক কাম করি, তুমি একটা বস্তা নেও, আমি একটা দোতারা নিই, চলো আমরা পথের মধ্যে নাইমা পড়ি, আমরা গান গায়া গায়া বাকি জীবন ভিক্ষা করি। ছফা ভাই আরও বলতেন, ক্যান খালি অতীতরে সামনে টাইন্যা আইনা বর্তমানের সুখ নষ্ট করো? অতীতরে কাগজের মধ্যে ঢাইলা দিয়া সামনের দিকে তাকাও। কিন্তু আমি কেবল অতীতেই পড়ে থাকি। সেইসব দিন কেবল অশরীরীর মতো টানতে থাকে। এইসব দিন আর লেখা হয় না।

দুই

বিয়ের পরে শংকরের বাসায় যখন প্রথম সংসার পেতেছি, তখন কলেজ শেষ করে টাউন হল থেকে বাজার করে ঘরে এসে রান্না করতাম। আমি মোটামুটি সবরকমের রান্না পারি। এখনো আমার মনের মতো রেসিপিতে বাড়িতে রান্না হয়। এইসব রান্না আম্মার রান্না দেখে দেখে, নিজ বাড়িতে রান্না করতে করতে শিখেছি।

বিয়ের পরে আমাদের শ্রেষ্ঠ উদযাপন থাকত, বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানে যাওয়া, বইমেলায় যাওয়া কোনোদিন বাদ পড়ত না, বন্ধের দিনগুলোতে দু'বেলা করে যেতাম। তখন এমন যানজট ছিল না। সাহিত্যের বাতাসে ভাসতেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। ধীরে ধীরে যখন আশরাফ ক্যারিয়ারে দারুণ সাফল্য পাওয়ায় দারুণ ব্যস্ততার জীবনে ঢুকে গেল, সময় পেলেই কিন্তু লিখত। আমাকে সময় দিতে পারত না। কিন্তু প্রতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের বিয়ে বার্ষিকীতে আমরা বইমেলায় যাওয়া ছাড়িনি। এটাই আমাদের উদ্‌যাপন। এবং ফেব্রুয়ারির সুতো ধরে ধরে আসা ৫ই মার্চ! আমার জন্মদিন। আমার কাছে স্পেশাল। সেদিন অবশ্য কিছু বন্ধুবান্ধব এসে যায়। এই দিন ছাড়া আমার জীবনের অস্তিত্ব কী? আমি সারা দিন শ্বশুরবাড়ির দীর্ঘ পরিবার, আর বাবার বাড়ির তুমুল আন্তরিকতা দায়িত্বের সাথে সামলে রাতের পর রাত লেখালিখি করেছি। এর পেছনে আমার কষ্টার্জিত উপার্জনও একেবারে কম ছিল না। দীর্ঘ দীর্ঘ ধারাবাহিক নাটক থেকে দারুণ সম্মানি পেতাম।

আমি গ্যাপ দিয়ে দিয়ে এমএ অবধি গেছি। এর মধ্যে একবার অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বাংলা বিভাগে দু'বছর মাস্টারি করেছি। ইংলিশ মিডিয়ামের বাচ্চারা প্রচণ্ড দুষ্ট ছিল। সপ্তাহে একদিন এই সেকশন বাংলা পড়তে বসত। এদের সামলাতে গিয়ে মহা হিমশিম দশা হলে প্রথম এদের দশ মিনিট গল্প শোনাতাম। বাকি বিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের চাইতে বেশি কাজ দিত। গল্পের শক্তি এমনই। দুই বছর চাকরি করে ছেড়ে দিই। এরপর দুই বছর *বাংলাবাজার* পত্রিকায় সাহিত্য সম্পাদনা করি। প্রতি সপ্তাহে তার কোম্পানি সারা দিন-মধ্যরাত অবধি কাজ তো করতই, ছুটির দিনগুলোতেও তার পাগল মালিকের সঙ্গে পাখি ধরতে, মাছ ধরতে সঙ্গ দিয়ে মধ্যরাতে ফিরত। ফলে গভীরভাবে অনুভব করতাম। সংসারে আমার থাকাটা খুব জরুরি। এসবের মধ্যেই আশরাফও আমার পরিবারকে নিজের করে নিয়েছিল। শিল্প নিয়ে মিথ্যাচার কোনোদিন আমরা

পরস্পরকে করিনি। অন্যদের তো দূরের কথা। আশরাফ ফের পুরোপুরি কবিতায় ফিরে এসেছে, তাও কমদিন নয়। ওর কবিতা অসাধারণ! মাসপিপলের জন্য নয়। অনেকে বলে, আমার সাহিত্যও কোনো কোনো অর্থে মাসপিপলের জন্য নয়।

বাংলাবাজার-এর পরে মনে মনে একটা আরামের কাজ খুঁজছিলাম। এর মধ্যে *অন্যদিন* ম্যাগাজিন অফিস থেকে নিয়মিত আমাদের বাসায় সৌজন্য সংখ্যা পাঠায় আর লেখা চায়। নিয়মিত ফোন। এভাবে এক বছর কেটে গেলে তাদের চোখ পড়ে *আশ্চর্য দেবশিশু* নামের আমার এক কালারের গল্পের বইয়ের প্রচ্ছদে।

উড়ুক্কুর পর আরও তিনটা উপন্যাস। কতবার বলেছি প্রকাশক আহমেদ মাহমুদুল হককে, এবার একটা গল্পের বই করুন। তিনি মিটমিট হেসে বলেন, গল্প অন্য কেউ করুক, উপন্যাস দিন। কষ্টে ক্ষোভে আমি দেশ প্রকাশনী থেকে বন্ধু পারভেজের প্রেসের সাহায্য নিয়ে গল্পের বই করি। মাজহার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হলে বলেন, আমাদের প্রকাশনায় আপনার যা ইচ্ছে বই বের করুন। গল্প, কবিতা, নাটক—যা ইচ্ছে। আমি *অন্যদিন*-এর সাহিত্য পাতার দায়িত্ব নিয়ে আরামের কাজে যুক্ত হলাম। প্রধান সম্পাদক মাসুম রহমান। সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক আবদুল্লাহ নাসের, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সিরাজুল কবির চৌধুরী কমল আজ ২৮ বছর ধরে আমাদের পারিবারিক মানুষ হয়ে গেছেন।

শিল্প যতদিন শিল্প না হয়ে উঠেছে, আমরা নিরন্তর পাঠ করে গেছি। পাঠ করে যাচ্ছি দেশ-বিদেশের সেসব বই, যা পড়লেই গিলে ফেলা যায় না। আমরা দীর্ঘবছর অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একটা স্বস্তি, মায়ার সংসারে আছি। আমি মনে করি সিরিয়াসলি সাহিত্যকে জীবনের অংশ করতে হলে বিয়ের আগে হাজার বার বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নেয়া ভালো যে, আপনার জীবনসঙ্গী আদৌ আপনার লেখকজীবনের সঙ্গী হতে পারবে কি না? আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আমাদের কন্যা অর্চি অতন্দ্রিলা। জাস্ট ওকে নিয়ে লেখা শুরু করলেই একটা বই হয়ে যাবে।

ভেবেছিলাম আজ নিজেদের বিয়ের দিনের কথা লিখব, কীভাবে আংটি পরাতে এসে কাবিন হয়ে গেল। কিন্তু মন অন্যদিকে ধাবিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের শৈশব-কৈশোরের কথা লিখি। আমার জন্মের অদ্ভুত মুহূর্তের কথাগুলো লিখি।

তিন

আব্বা চেয়েছিলেন তাঁদের দুই সন্তান হোক। পরপর দুই সন্তান হল। এরপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ভাই, এরপর আমি, আমার ছোট বোন ঝর্না আর সবচেয়ে ছোট জুয়েলের জন্ম হল। জানি না, আমাদের জন্ম এরপরও কীভাবে এবং কেন হলো? যাহোক, জন্মের পরে আমি মারা গেছি ভেবে চতুর্থ সন্তান আমাকে নিয়ে আম্মা ছাড়া আর কারো রোদন ছিল না। আব্বার হালুয়াঘাটে চাকরির পোস্টিং। সপ্তাহে একবার আসতেন অথবা আসতেন না। আব্বা যেহেতু এক বা দু'সন্তানের বেশি চাইতেন না, আম্মার ক্রোধ আর কষ্ট আর রোদন চোখের পানি হয়ে বের হয়নি। কিন্তু আম্মা কেঁদেছিলেন ভেতরে ভেতরে। পরে শুনেছি সেদিন বন্ধের দিন ছিল না। ফলে নাই টেলিফোন যুগে আব্বাকে কেউ জানাতেও পারছিল না। আমার কাফন পরানো হবে হবে অবস্থা। হঠাৎ! যেন জাদু! আব্বা এসে হাজির। তিনি দাপ্‌টে এসে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কারো কথা না শুনে আমার পুরো শরীর ঝাঁকিয়ে থাপ্পড় দিতে থাকলেন। সেদিন সবাইকে হতবাক করে আমি কেঁদে উঠলাম! পাঁচই মার্চ এজন্যই হয়তো আজীবন আমার কাছে স্পেশাল।

আমি আগেই বলেছি, আমি ধারাবাহিক স্মৃতি বর্ণনা করব না।

তবে এখন পর্যন্ত হালুয়াঘাটের দড়িনগুয়া নানার বাড়ি আরও কিছুক্ষণ থাকি। মুক্তিযুদ্ধের পরে। স্কুলে। আমি প্রথম শ্রেণিতে তিনটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। যেহেতু নানাবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না এমন ভাবনা ছিল, আমি ধারা স্কুলে ভর্তি হলাম। কিন্তু আমাদের কল্পনার বাইরে আব্বার ময়মনসিংহ শহরে পোস্টিং হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে নানার বাড়ির তেপান্তর থেকে শহরে দাদার বানানো বাড়ি আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার এলাকায় এসে উঠলাম। আমার এত ধনী দাদা সবাইকে প্রচুর জমি বাড়ি ভাগ করে দিয়ে গেছেন। আমি তাঁদের কোনোদিন দেখিনি। তখন তাঁরা মারা গেছেন। কিন্তু এ কী! দুই রুমের ইটপাথরের বাড়ি! তবে একটা উঠোন ছিল, তার ওপারে রান্নাঘর! কত জোছনারাত, সেই উঠোনের রাত হাহাকারে ভাসিয়ে দিয়েছি!

একটা ঘটনা আমাদের ছোট চাচা বলছিলেন, তিনি ছিলেন আমার সৎ দাদির সন্তান। দাদির মৃত্যুর পরে দাদা যখন বিয়ে করেন, আব্বা তখন কিশোর। (আব্বা কিন্তু ছোট চাচার পড়াশোনার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন কিন্তু জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই।) বিয়ের রাত পেরোলে সকালে ছোট দাদি মিষ্টি নিয়ে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দাঁত ব্রাশ করেছ? আব্বা বললেন, আমি তো দাঁত ব্রাশ করি না।

মাজন দিয়েছ?

না, আমি এইসব না করেই খাই।

এই আমার আব্বা। তাকে যে যেভাবে ঠকিয়েছেন তিনি ঠকেছেন। নিজের বিশাল ভিটে দান করে দিয়েছেন বড় ভাইদের ছেলেমেয়েদের। তাঁর কাছের আত্মীয়রা তার বোহেমিয়ান স্বভাবের সুযোগ নিয়ে জলের দামে তাঁর সম্পত্তি কিনে নিয়ে গেছেন। আব্বারও হুঁশও ছিল না। তাঁর বোহেমিয়ান স্বভাবের কারণে আমার আম্মা আমাদের জন্য কীভাবে জীবন দিয়েছিলেন সেইসব কথা জীবদ্দশায় লিখে যেতে পারব তো!

শহরে এসে আমি প্রথম নাসিরাবাদ স্কুলে ভর্তি হই। কিন্তু কিছু দিন ক্লাস করে ছেড়েছিলাম ধর্মের হুজুরের ভয়ে। একটু

ভুল হলেই উনি হাতের ওপর কঞ্চি দিয়ে মারতেন। আম্মা এসব সহ্য করতে পারেননি। তিনি আমাকে সানকিপাড়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আহা! সানকিপাড়া ইশকুল! বিশাল রেললাইনটা ধীরে ধীরে আমার প্রাণের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে থাকল!

আমার প্রথম প্রেম ক্লাস থ্রিতে থাকতেই। মেয়েদের শরীরে কোন বয়সে কী তরঙ্গ হয়, আমি শৈশব থেকেই জানি। প্রায়ই নানা বাড়ি যেতাম। শহর থেকে তালুকদার বাড়িতে আসা সদ্য গোঁফ ওঠা সুন্দর এক ছেলে (আমাদের খাঁ বাড়ির রাস্তার অপজিটে তালুকদার বাড়ি ছিল) খুব চক্কর খাচ্ছিল। সেই প্রথম কাঁঠালপাতায় কুপি জ্বালিয়ে কাজল বানিয়ে প্রথম আমার চোখে মাখা। কিন্তু আমি তার মুখোমুখি হলেই উলটো দিকে হাঁটা দিতাম। কিন্তু সেই ছেলে আমার মতো পিচ্চি মেয়ের সাথেও কিন্তু টাংকি মারত। এরপর এরচেয়ে মহা গভীর প্রেম এসেছে জীবনে, ভেতরে বিষের বালি নিয়ে উলটো দিকে আমার হাঁটার কারণে সেসব প্রেম পরিণতি পায়নি। সে সময় আমরা কেরোলিন অথবা টেট্রন কাপড়ের জামা কিনতাম। ক্লাস ফোরে ফুপুর সোর্সে এক বড়লোক বাড়ি গেলাম। প্রচণ্ড গরমে হাঁপাচ্ছিলাম। তারা কোত্থেকে বোতল এনে গ্লাসে পানি ভরে দিল। আহা, ঠান্ডা! আমি অবাক, আমরা কেন তাহলে জগ থেকে খাই? অনেক কষ্টে একটা বোতল জোগাড় করে পানি ঢেলে সারাদিন অপেক্ষা করলাম। আমাদের বোতল ঠান্ডা পানি দিল না। তখন অবধি ঢাকায় এসেও ফ্রিজ দেখিনি। তাই অনেক দিন ওই বাড়ির বোতলের ঠান্ডা পানির বিস্ময় রয়েই গিয়েছিল।

সেই প্রেম ছিল কঠিন। *চাঁদের হাট*-এ যুক্ত হওয়ার পরে। আমাদের বাসার পাশেই আমাদের একটা বড় মাঠ ছিল, পাড়ার মধ্যে সেই মাঠ ছিল আমাদের অহংকারের কারণ। সেই মাঠে রুবী খেলতে আসত। তখন ক্লাস টুয়ে পড়ি আমি। রুবী বিদ্যাময়ী স্কুলে ক্লাস ফোরে। খেলতে গিয়ে জানতে পারি রুবী ছড়া লেখে। বাপরে! এরপর কত স্মৃতি! কত ঘটনা! ধীরে ধীরে আমিও ছড়া

লিখি। *জাতীয় শিশু পত্রিকার* প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয় গল্প। রুবীর মামা কথাসাহিত্যিক রাহাত খান। রুবী পারভীন সুলতানা নামে লেখালিখি করে। সেই রুবী ক্লাস সিক্সে আমাকে *চাঁদের হাট*-এ নিয়ে যায়। তখন একটা ছিপছিপে ছেলে, এবং তার ক্লাসিক বন্ধু, যারা মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার সময়, *বাতাসে ধানের শব্দ* নামের একটা পত্রিকা বের করত, সে হঠাৎ আমাকে বলল, তোমাকে আমি চিনি। তুমি নীল পুঁতির মালা পরে মুসলিম ইনস্টিটিউটে ছড়া পড়েছিলে! আমি তখন তোমাকে দেখেছি! তার দিকে তাকাই, আমার যেন কী হয়ে যায়! সেই অনুভব, সেই প্রথম!

এরপর সেই বয়স থেকেই শুরু হয় আমাদের ব্যক্তিত্বের লড়াই। এরপর কত স্মৃতি। কত স্বপ্নভঙ্গ!

আমি কোনোদিন আমাদের শহরের জীবনকে মানতে পারিনি, কেবলই মনে হত দূরে কোথাও চলে যাই, তখন *ঠাকুরমার ঝুলি* পড়েছি, আলেস্কান্দর বেলায়েভের *উভচর মানুষ* পড়েছি, এরপর আরও আরও বই পড়ে অল্প বয়সে পেকে যেতে থাকলাম। যখন নিউ ইয়র্কে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যাই, হঠাৎ *চাঁদের হাট*-এর সেই ছেলের ফোন। আশরাফ আমার হাতে রিসিভার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ওই প্রথম জানা হয়, সে মনে করত, আমি তাকে পাত্তা দিই না, গুরুত্ব দিই না। তার নিজেরও ব্যক্তিত্ব প্রখর ছিল, তাই সে সাহস করে আমাকে প্রস্তাব করতে পারেনি, যদি প্রত্যাখ্যান করি? সে এক বিপর্যস্ত ক্লাসমেটকে বিয়ে করেছে। যে তার স্রেফ বন্ধু ছিল, এবং আমাকে কেন্দ্র করে তার দিনরাত্রির কষ্টগুলি জানত। মেয়েটার জন্য অনেক ছেলে খুঁজেছে সে, একদিন কেউ বলে, অতই যদি মায়া, নিজে বিয়ে করে দেখিয়ে দে। সে বিয়ে করে ফেলে যেভাবেই হোক।

এখন তাদের দাম্পত্য অসুখের একমাত্র কারণ আমি। কারণ আমাকে নিয়ে লেখা দিনরাত্রির অনুভূতির ক্ষরণের ডায়রি যে সেই মেয়েটার কাছে রেখেছিল। এখন ডায়রির পয়েন্ট ধরে ধরে সে বলে, তুমি তো করুণা করেছো আমাকে, ভালোবাসা সব তো বিউটির প্রতি। আমি প্রসঙ্গ ঘোরাই। ফেলে আসা প্রেমের প্রতি

আমার কোনো তাড়না নেই। দেখা হওয়ার পরই জেনেছি, এই মানুষ সেই মানুষ নেই। অথবা আমার ম্যাচুরিটি অনেক বেড়ে গেছে।

আশরাফ আমাকে পড়ে ফেলেছে। ও জেনে ফেলেছে সে ছেলেকে নিয়ে আমার মধ্যে আর কম্পন নেই। নিশ্চয় তারও কারণ ছিল। কারণ আশরাফও এক মেয়ের দারুণ প্রেমে পড়েছিল। নিশ্চয় আসবে সেসব কথা। আপাতত থাক।
আমার বিয়ের বহু বছর পরে *চাঁদের হাট*-এর সে যখন ফোন দিল, তখন ভূতের গলি থাকি। তখনও ভেতরে দারুণ বেদনা ছিল তাকে নিয়ে। যখন দেখা হল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদে, তখন দেখলাম সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক সুপুরুষকে। যার দিকে আমি দ্বিধাহীন তাকাতে পারি, আর বলতে পারি, আপনি আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছেন, কিন্তু আমি যে ছিপছিপে লাজুক ছেলেটার প্রেমে পড়েছিলাম, সেই মানুষটা আপনি নন।
হা হা, একদিন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে *দৈনিক দেশ* অফিসে গেলাম শাড়ি পরে বয়স বাড়িয়ে। তখন আশরাফের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক সুন্দরী ডাক্তারের সাথে। জাস্ট আমাকে দেখেই আশরাফ বিয়ে ক্যান্সেল করে দিল।

আমার বিয়ে প্রসঙ্গে আসছি, মনে থাকতে থাকতে রুবীর বিয়ের কথা বলি। রুবী স্টুডেন্ট ভালো ছিল। এমএতে বাংলায় সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়। আমি যখন সংসারের পাশাপাশি লেখার সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছি, রুবী তখন এমএ করে কেয়ারে চাকরি করে মোটর সাইকেলে শহর-গ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানেই পরিচয় হয় অসাধারণ দেখতে দারুণ মন সুন্দর আজাদ ভাইয়ের সাথে। আশরাফের মতো রুবীর লেখালিখির মধ্যেও দীর্ঘ বিরতি তৈরি হয়।

দুই হাজার সালে রুবী ঢাকায় সিটি কলেজে জয়েন করে এবং পুরোদমে লেখালিখি শুরু হয় তার। সব জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশও হতে থাকে পারভীন সুলতানার লেখা। রুবীর লেখার

ভাষা ও বিষয় ধারালো।

অপজিটে ফ্ল্যাট কিনে শুরু হয় তার রাজধানীর সুখের দাম্পত্য। এত ভালো লিখেও, লেখার মধ্যে নানারকম নিরীক্ষা করে জাতীয় সব পত্রিকায় লেখা ছাপার পরও রুবী সাহিত্যে তার প্রাপ্য জায়গাটা পায়নি, এ নিয়ে আমার বেদনার শেষ নেই। প্রায়ই রুবীর বাসায় যাই। একদিন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে জানতে পারি, স্ট্রোক করে আজাদ ভাই মারা গেছেন। রুবীর জীবনের বেদনা সীমাহীন হয়ে গেছে।

চার

আম্মা যখন নাসির আহমেদকে দায়িত্ব দিলেন তখন আমরা তিন ভাইবোন, সাথে একজন মামাও ছিলেন, ছোট মামির ভাই, যে আমাকে সব সময় মাদার বলে ডাকে।

আমাকে হঠাৎ নাসির ভাই বলেন, একজন ছেলে *দৈনিক দেশ* অফিসে তোমার সাথে পরিচিত হয়ে সাংঘাতিক মুগ্ধ হয়েছিক, খুব ভালো কবিতা লেখে, তার ওখানে ঘুরে আসি?

আমি বলি, ধুর তেমন কোন মানুষ হলে আমার মনে থাকত, এ ছাড়া এভাবে কারো বাড়ি আমরা কেন যাব?

নাসির ভাই কিছুক্ষণ চুপ করে বলেন, চল আহসান হাবীবের বাসায় যাই।

সবাই মিলে তাই ঠিক হল।

আমরা অচেনা ঢাকা শহর ধরে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। মামা বললেন, তোরা বেশি সময় থাকলে আমি অন্য জায়গায় একটা কাজে যাব।

একটা বাসার সামনে দাঁড়ালাম।